বাংলা ভাষায় সিভিল সোসাইটি চর্চা

গালিব ইসলাম

প্রায় অখ্যাত একটি প্রকাশনা থেকে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে বলা যায়, একেবারে মাতৃভাষা বাংলায়, বেশ সচ্ছন্দ রচনা সিভিল সোসাইটি বা সুশীল সমাজ-এর উপর একটা বই হাতে এসে গেল। বাংলা ভাষায় নাগরিক সমাজ নিয়ে এ ধরণের বই সম্ভবতঃ প্রথম। সাগ্রহে পড়ে ফেললাম। ইউরোপ এবং ভারতে সিভিল সোসাইটির উৎস, ইতিহাস, সংজ্ঞার সন্ধানের পাশাপাশি এদেশে তার স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটি যেকোন কৌতূহলী পাঠকের কায়ে সমাদরণীয় হতে পারে, বলে আমার বিশ্বাস। বইটি লিখেছেন কনিষ্ক চৌধুরী।

বইটি লেখার তাগিদ এসেছে সম্ভবতঃ সাম্প্রতিককালে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার জন্য। লেখক এজন্য যে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে একটা তাত্ত্বিক কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন, তাতে পরিশ্রম ও নিষ্ঠা পাঠকের প্রশংসা পাবে। কলকাতার এক যুবক রিজওয়ানুরের অস্বাভাবিক মৃত্যু কলকাতার নাগরিক সমাজকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। তার আগে পরে সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম-রাজারহাট জমি দখল, কৃষক উৎখাত, রেশন কাণ্ড, তসলিমা নাসরিন বিতাড়ন কলকাতার হৃদয় ছুঁয়েছিল, আবার শিল্পী মকবুল ফিদার ওপর ধর্মীয় ফ্যাসিবাদীদের আক্রমণ নিয়ে কলকাতার প্রায় নীরবতা ও তসলিমা প্রসঙ্গে অতিসক্রিয়তা সামঞ্জস্যহীন— ১৪ নভেম্বর ২০০৭ অসমের দিসপুরে আদিবাসীদের আইডেনটিটির দাবিকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত গণহত্যার প্রতিবাদে কলকাতায় আদিবাসীরা একটা প্রতিবাদী মিছিল সংগঠিত করেছিলেন।

সেই মিছিলে এই আলোচকও হেঁটেছিলেন। সেদিন, আরও উল্লেখ্য, কলকাতার কোনও বুদ্ধিজীবীই উপস্থিত ছিলেন না বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষে চাপা ক্ষোভও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং বিস্ময়ের হলেও সত্য, সেই নাগরিক ঔদাসিন্যের রহস্যের কোনও ব্যাখ্যা আজও উদ্ধার করতে পারিনি। সুশীল সমাজের ওপর বইটি লেখার সময় লেখকের নির্মোহ পাঠককে ভাবাবে। লেখকের দাবি মতো, সুশীল সমাজের মতো এরকম একটা বিষয়ের ওপর আলোচনা লিটিল ম্যাগাজিনের প্রত্যয় থেকে উঠে এসেছে। ২০০২ সাল থেকেই সেই চর্চায় লিটল ম্যাগাজিনের দায়বদ্ধতা ইতিমধ্যেই স্বীকৃত।

তাত্ত্বিকভাবে বইটি পড়া এই জন্যে জরুরী যে, সিভিল সোসাইটির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রবাদের দমনপীড়ন প্রসঙ্গে সিভিল সোসাইটির বাদী ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠা এবং সর্বোপরি একটা প্রেসার গ্রুপের ফর্মে সক্রিয়তা কতদূর প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তা জানা দরকার। নাগরিক প্রত্যাশার প্রতি এই সমাজের সর্বক্ষণের অতন্দ্র প্রহরা কতদূর তাও পাঠকের জানার জন্য বইটি পড়তে হবে। সিভিল সোসাইটি শব্দটি প্রাচীন রোম সভ্যতার অবদান, তখন রাষ্ট্র ও সমাজ ছিল অভিন্ন সত্ত্বা। জমি ও যৌনতার সম্পর্কের প্রশ্নে রোমান সভ্যতা এই অধিকারের মর্যাদা দিয়েছিল।

মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতাবোধ একেবারেই ছিল না। থাকা সম্ভবও নয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হতে শুরু করে। বইটিতে চমৎকারভাবে সূত্রায়িত হয়েছে দার্শনিক হবস - লক, স্মিথ - ফার্গুসেন-হাচেসন প্রমুখদের পাশাপাশি উনবিংশ শতাব্দির ইউরোপের সিভিল সোসাইটির বিকাশ এবং হেগেল ফুয়েরবাক - মার্কস পরে গ্রামশির ভাবনাগুলিকে চমৎকার সূত্রায়িত করেছেন লেখক। এই ধারায় রাষ্ট্র সম্পর্কে রয়েছে এক অতৃপ্তি এবং প্রশ্নও উঠেছে অনেক।

ভারতের প্রেক্ষিতে প্রবেশের সময় লেখক দেখিয়েছেন সিভিল সোসাইটি যেভাবে ইউরোপে বিকশিত সামন্ততন্ত্র ভেঙে ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের প্রক্রিয়ায় পরিপুষ্ট, এখানে তা সম্ভব নয়। কারণ, ভারত সামন্ত্রতন্ত্রের যুগের মধ্যেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে এক দুঃসহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বন্দী হয়ে পড়ে। মধ্যসত্ত্বভোগী নতুন জমিদার শ্রেণী এবং ইংরেজ শাসকের মিলিত ব্যবস্থাই ছিল সমাজের মূল কাঠামো। মুঘল আমলে সামন্ত্র অর্থনীতির মধ্যেও পুঁজিবাদী বিকাশ প্রচ্ছন্ন ছিল, এটা দেখিয়েছেন ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব।

কিন্তু বৃটিশ শাসনের ফলে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। বৃটিশ তার পুঁজির স্বার্থ চাপিয়ে দেয় এদেশের অর্থনীতির ওপর। এজন্য লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে লাংকাশায়ারের কারখানার চিমনীর ধোঁয়া বেরুনোর স্থায়ী ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে এদেশের বুরজোয়াজি ছিল মুৎসুদ্দি (comprador) চরিত্রের এবং এদেশে সামন্ত স্বৈরাচারের জায়গা নিয়েছিল বৃটিশ স্বৈরাচার। লেখকের এই পর্বে আলোচনা অত্যন্ত সুর্নিদিষ্ট ও সহজবোধ্য হয়ে ওঠায় পাঠকের বুঝতে সুবিধে হবে, ইউরোপের ধনতন্ত্রের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশ এবং এদেশে কালোনিয়াল ক্যাপিটালের যুগে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকশের ধারণার মৌলিক তফাৎ। উনবিংশ শতাব্দির এই পাঠটি যথার্থভাবে না বুঝলে আজকের এদেশে যথার্থ সিভিল সোসাইটির উপস্থিতি— অনুপস্থিতি বা খণ্ডিত, বিভগ্ন বা অপুষ্ট সিভিল সোসাইটির স্বরূপটি ভালভাবে বোঝা যাবে না।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, ভারতে সিভিল সোসাইটির যথার্থ বিকাশ প্রত্যাশিত নয়। প্রধান কারণ হল, ঔপনিবেশিক শাসন থেকে এদেশে ১৯৪৭ সালে আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক আর্থ সামাজিক কাঠামোয় সমঝোতার নীতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়। শাসকশ্রেণীর এই দোঁআশলা চরিত্রকে বহন করে চলেছে এদেশের সিভিল সোসাইটি বা আলোকিত সমাজ। সরাসরি ভূমিস্বার্থ না থাকলেও এই সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্র এবং ভূমি থেকে উৎসারিত স্বার্থ মেন্টাল কমপ্লেক্স থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ফলতঃ রাষ্ট্রব্যবস্থার দমনপীড়নের প্রশ্নে এই সমাজ কিছুতেই

ক্রান্তির সূচনা তো দূরের কথা রুখে দাঁড়াতেই ব্যর্থ। যে কোনও না কোনো ভাবে রাষ্ট্রবাদের স্বার্থে এই সমাজ জড়িয়ে পড়ছে। ধর্মীয় ফ্যাসিবাদির মত সামাজিক ফ্যসিবাদও জড়িয়ে পড়ছে রাষ্ট্রের আধিপত্য ও নিরুঙ্কুশ উচ্চতার সূত্রে। রাষ্ট্র নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী বা সিভিল সোসাইটি প্রায় দুর্লভ, যা সোনার পাথরঘটির মতো।

তা সত্ত্বেও, তাত্ত্বিকভাবে এবং সমাজতত্ত্বের হিসাবে এদেশে এরাজ্যে সিভিল সোসাইটির জন্ম ও বিকাশ যথাযথ না হলেও আধা - সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর - রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটা জনমত গড়ে উঠেছে। গুজরাট গণহত্যা, সংসদ হামলায় অধ্যাপক জন্ম দিচ্ছে। সত্তর দশকের রক্তাক্ত দিনগুলোতে সংগঠিত গণহত্যার কালে, পুলিশের নারকীয় ত্রাস সংঘটিত হবার ঘটনায় নাগরিকমন জনমত গঠনের প্রক্রিয়ায় কি উঠে আসে নি? ঠিক এদেশের সিভিল সোসাইটি বলতে একেবারে ইউরোপীয় মডেল কেন হবে? তবে সোসাইটি রাষ্ট্রস্বার্থে সংশ্লিষ্ট। রাষ্ট্রের নীতিও ও কর্মকাণ্ডের প্রশ্নে তারা রাষ্ট্রের পক্ষে হাতিয়ার হয়ে ওঠে। তার আর্থ সামাজিক - রাজনৈতিক-সংস্কৃতিক প্রেক্ষিত থেকেই তো প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে। কতটা প্রেসার গ্রুপ হয়ে উঠেছে তাও দেখতে হবে।

কৌশিক গাঙ্গুলি, অভিজিৎ সিনহাদের ওপর পুলিশের নকশাল নাশকতার সন্দেহ, গ্রেপ্তার, থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গর্জে ওঠে। কবি শঙ্খ ঘোষরা কি সক্রিয় হয়নি? তাতে কাজও হয়েছে। নন্দীগ্রাম পর্বে অপর্ণা সেন, শাওলি মিত্র - শুভাপ্রসন্নরা আমাদের অনেকটা দূর এগিয়ে দিয়েছেন বৈকি কলকাতার অতবড় মিছিল আমাদের অনুপ্রাণিত আজও করে বৈকি! যান্ত্রিকভাবে সংজ্ঞা অনুসরণ করে নয়, অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও এদেশে, এরাজ্যে রাষ্ট্রর সঙ্গে এটা অ্যালিয়েনেশনে থেকে প্রতিবাদী সত্ত্বা অর্জন কিন্তু ইদানিং যথেষ্ট ও প্রত্যয় ঋদ্ধ হয়ে উঠছে, নয় কি? সুতরাং এদেশে সিভিল সোসাইটি বিকল্প ইউরোপীয় সমাজ গাণিতিক ফর্মে কেন হবে?

আধা সামন্ত্রতান্ত্রিক - আধা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের অস্তিত্ব, আধিপত্য ও প্রভুত্ব সবটাই রাষ্ট্রের অধীন বিভিন্ন ইনস্টিটউশনের মাধ্যমেই সংগঠিত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রযন্ত্রের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যেমন এসব সংগঠিত হয়ে থাকে তেমনই এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই তার বিরোধীতাও থাকে। কিন্তু মূলতঃ রাষ্ট্রের এই অবস্থানকে বিরোধীতা রাষ্ট্রযন্ত্রের ইনস্টিউশনের বাইরেও আরও প্রসারিত ও সংগঠিত হয়েও থাকে। রাষ্ট্র সাধারণতঃ পুলিশ - সেনাবাহিনী— আমলা - বিচার ব্যবস্থা ছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্য দিয়ে তার সার্বিক অস্তিত্ব, আধিপত্য ও প্রভুত্ব বজায় রাখে। যেমন নন্দীগ্রমে পুলিশের গণহত্যাকে সমর্থন জানান একদল বুদ্ধিজীবী কিন্তু বিপরীতে বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। বুদ্ধিজীবী, সৃজনকৃত্যের মানুষরাও এই আধিপত্য সমর্থন করে থাকে। এটাই সিভিল সোসাইটি। গ্রামশির মতে হেজিমনিজম ও সিভিল সোসাইটির দ্বন্দ্ব মিলনাত্মক হিসেবে রাষ্ট্রের হাতিয়ারে পরিণত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের এই ধরণের অস্তিত্বের দর্শনকে প্রচারমাধ্যমও বেশিরবাগ ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে প্রচারও করে থাকে। এইসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, মানবাধিকার অবমাননা ও লঙ্ঘন সবই সংগঠিত হয়ে থাকে বলেই সেই অর্থে রাষ্ট্রকে একক ধরলে এইসব প্রতিষ্ঠান একটা অংশ হিসেবেই ধরতে হবে রাষ্ট্রের এবং এই সিভিল সোসাইটি কার্যতঃ মানসিক স্বীকৃতি আদায়ে নেমে পড়ে। রাষ্ট্রের এদেশে নিপীড়নমূলক অবস্থানকে একমাত্র ক্রান্তিকারী আন্দোলন দিয়েই প্রতিরোধ করা যেতে পারে। গোবলয়ের সংখ্যালঘু নিধন ও উত্তর পূর্ব ভারত বিশেষতঃ কাশ্মীর থেকে মণিপুর সর্বত্রই রাষ্ট্র যে সন্ত্রাস সংঘটিত করে চলেছে তা ভয়াবহ। রাষ্ট্রের সঙ্গে একটা অ্যালিয়েনেশন রেখে নাগরিকদের মানবাধিকার সুরক্ষার মধ্য দিয়ে যতটা সম্ভব রাষ্ট্রের ঔদ্ধত্যকে বিনত রাখা সমাজদর্শনের প্রেক্ষিতেই গড়ে উঠবে। আর ইউরোপে সিভিল সোসাইটিই কি সমস্ত প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে? রাষ্ট্র সম্পর্কে অতৃপ্তি, ক্ষোভ অনেকটাই সংগঠিত হয়েছে, কিন্তু দমন পীড়নের যন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রমুক্তির ভাবনা কি ভাবা গেছে? লেখকের তিনটি সিদ্ধান্ত যা তিনি নির্যাস হিসেবে বইয়ের শেষে এসে সূত্রায়িত করেছেন, তার সঙ্গে একমত হয়েও এবং দ্বিতীয় সূত্রটির সম্পর্কে একটু দ্বিমত রেখে বিশেষতঃ এই রাষ্ট্র দমনপীড়নের সঙ্গে আধিপত্যবাদী এবং এই দ্বন্দ্বই প্রধান হয়ে উঠছে বলে মনে হয়। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর হিসাব মতে এদেশে চল্লিশ কোটিরও বেশি মানুষ প্রতিদিন মানবাধিকার অবমাননা ও লঙ্ঘনের শিকার হন।

পরিশেষে বইটি খবই সংক্ষেপিত। এদেশীয় স্তরে সিভিল সোসাইটির রূপ ও ভূমিকা খণ্ডিত হলেও নানা ঘটনায় উঠে আসার বর্ণনা ও রাজনৈতিক দলগুলির ধর্মীয় সংগঠনের মতো সামাজিক ফ্যাসিবাদে আত্মপ্রকাশ ক্রমশঃই একটা প্রতিভারতীয় পুঁজির অসম বিকাশের চরিত্রের বিপরীতে কৃষক - শ্রমিক - মধ্যবিত্তের সামগ্রিক মনের মুক্তির সংগ্রামের উৎস থেকেই উঠে আসছে। হ্যাঁ উঠে আসছেই তাঁর নানা সঙ্গতি - অসঙ্গতি নিয়েই। এদেশে মানবাধিকার আন্দোলনও একধরনের সুউচ্চ নাগরিক মনের সংগ্রামও। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আকর্ষণীয়। বইটির নির্মাণ ও শিল্প গুণমান যথাযথ। পরিশেষে যথাসময় এ ধরনের চর্চার অবতারনার জন্য লেখক সাধুবাদ পাবনে।

সিভিল সোসাইটি ইউরোপ - ভারত
কনিষ্ক চৌধুরী
আঞ্চলিক দর্পণ